প্যারীচাঁদ ও বিদ্যাসাগর-মানস

গোলাম মুরশিদ

মধ্যযুগীয় চিন্তা ও জীবনধারার প্রতি দীর্ঘকাল পোষিত আস্থা ও মমত্ব বাংলা দেশে পরিবর্তিত হতে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। সে সময়ে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় বণিক ও বেনিয়ান ভাগ্যোন্নতি করেছিলেন। তা ছাড়া নতুন ভূমিব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হয়ে একদল ভূস্বামী নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত আয়ের ভাগী হয়েছিলেন। এই বণিক, বেনিয়ান ও ভূস্বামীরা কলকাতা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁদের সঙ্গে, স্বাভাবিকভাবেই, যুক্ত হলেন শিক্ষক ও করণিক সম্প্রদায়। নগরকেন্দ্রিক এঁদের সম্মিলিত জীবনযাপনের ফলে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও দ্রুতপরিবর্তনশীলতা আগমন করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তার সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের দরুণ নব্য-শিক্ষিতদের ধ্যানধারণায় এমন বিপ্লব সূচিত হয়, যা এ যাবৎ অভাবনীয় ছিলো। শতাব্দীর প্রথম পাদে ফোর্ট উইলিয়াম, হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজ, বহু সংখ্যক বিদ্যালয়, টেক্সট্‌বুক সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপন, কয়েকটি পত্রপত্রিকার প্রচলন এবং খ্রীষ্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচারের ফল-স্বরূপ এতদিনের নিস্তরঙ্গ হিন্দু মনোজীবন আন্দোলিত হতে আরম্ভ করে। হিন্দু ধর্মের বড়ো রকমের সংস্কার হলো কিংবা জনগণ স্বধর্ম ত্যাগ করলো

—তা নয়, কিন্তু যে ধর্ম, সংস্কার ও আচার এতোকাল ছিলো প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধার বিষয়, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলো। নানাজন নানাভাবে তার যথার্থ-মূল্য যাচাই করে দেখতে চাইলো। ধর্মের তুলনামূলক বিচার ও মূল্যায়ন এবং প্রচলিত মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে কৌতূহলী চিত্তে অস্থায়ী কিন্তু অভ্রান্ত একটি নৈরাজ্যের সৃষ্টি হলো। এতদিনের বিশ্বাসে সংশয়, অচঞ্চল হৃদয়ে দ্বন্দ্ব, পরস্পরবিরোধী ভাব ও মতামতের এক অদ্ভুত সম্মিলন এ যুগের প্রায় সব মানুষের চরিত্রে কৌতুকের সঙ্গে লক্ষণীয়। অবশ্য তার কারণ সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। নতুনকাল যখন নতুন মূল্যবোধ নিয়ে প্রাচীন সমাজের দ্বারে উপনীত হয়, তখন তার অভিঘাতে যুগজীর্ণ সমাজ ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু পরিবর্তিত মূল্যবোধের সাথে আপোষ করতে অধিকাংশ মানুষই যথেষ্ট সময় নেয়। বিধ্বস্ত প্রাচীন ও গঠনীয় নবমূল্যবোধহীন অন্তবর্তীকাল—সমাজতত্ত্বে যাকে বলে anomy, সে সময়টাই নানা বিপ্রতীপভাবে ঠাসা থাকে। এ যুগের সন্তান রাধাকান্ত দেব[১] অথবা রামমোহন রায়ের[২] মধ্যেএ কালের স্ববিরোধ সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিকভাবেই যেন বিধৃত আছে।

রাধাকান্ত দেব—রক্ষণশীল দলের যিনি নেতা ছিলেন—তাঁর চরিত্রে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী ধ্যানধারণার সমাবেশ সম্ভাব্য না হলেও, নিশ্চিতভাবে দ্রষ্টব্য। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী ও ইংরেজীতে সুশিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারে অতুৎসাহী, এই শক্তিধর পুরুষ হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির প্রতি আশ্চর্য আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। সতীদাহ তাঁর আপন পরিবারে অপ্রচলিত ছিলো যদিও, তবু সতীদাহ নিবারিত হলে প্রাচীনপন্থীদের আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তিনিই। ইংরেজদের সাথে এঁর যোগাযোগ যেমন অন্তরঙ্গ ছিলো, এ দেশে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলনে তাঁর উৎসাহও ততোধিক ছিলো। হিন্দু কলেজ, টেক্‌স্‌ট্

---

১. রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪—১৮৬৭)
২. রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩)

বুক সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপনে তাঁর দান ও শ্রম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। অথচ সামাজিক প্রতিষ্ঠা স্থায়ী ও অক্ষয় করার মানসে ধর্মের সংকীর্ণ, অনর্থক ও মিথ্যা আচারকে অবিচলিত আসনে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্যে তাঁর প্রাণপণ সংগ্রাম দেখে তাঁকে স্ববিরোধের চরম বলে ঐতিহাসিক মনে করেন :

The religious and social outlook of Radhakanta was so much at variance with his enthusiasm for the case of education and particularly English education, that he was described by a writer not unsympathetic to him as an "anacharonism.[৩]

অবশ্য ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আপাত সংস্কারমুক্তির কারণ অপ্রত্যক্ষ নয়। শাসকদের ভাষা শিখে বৈষয়িক উন্নতির আত্যন্তিক উৎকাঙক্ষা থেকে এই ইংরেজী প্রীতির জন্ম।

The orthodox party···desired English education for sheer practical considerations. During muslim rule Hindus did not hesitate to cultivate persian and even Arabic which had securd them gainful employment.[৪]

বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ধর্মীয় যে কোনো অনুশাসনের সঙ্গে আপোষ করতেও প্রাচীন পন্থীরা দ্বিধা করতেন না। প্রয়োজন-অনুসারে ইংরেজী বিদ্যালয় অথবা অফিস থেকে ফিরে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ঘরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন ; শুদ্ধমাত্র স্বার্থবুদ্ধিপরিচালিত, এ শ্রেণীর লোকেরা।

ভিন্ন ধর্মের সার কথাটি জেনে এবং পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রামমোহন পূর্বপুরুষের ধর্মান্ধ কুসংস্কারের স্বরূপ পুরোপুরি না হলেও অনেকটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হয়তো এ ব্যাপারে স্নেহশীলা আত্মীয়ার সহমরণ তাঁকে আরো একনিষ্ঠ করেছিলো। যথার্থ সনাতন

---

৩. A. F. Salahuddin Ahmed, Social ideas and Social change in Bengal (1818-1835), Leiden, 1965, পৃঃ ২৮

৪. পূর্বোক্ত, পৃ ২০

ধর্ম কী, এবং ধর্মের নামে সংস্কার ও আচার সর্বস্বতা সমকালীন মানুষের দৃষ্টিকে কতখানি অস্বচ্ছ করেছিলো, রামমোহন তা বিশ্লিষ্ট করে দেখতে চাইলেন। তিনি হয়তো দেখলেন, ধর্মের মূল বাণীটি মানবতা। কিন্তু ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার নিমিত্ত গড়ে উঠেছে বর্ণাশ্রম। পরশ্রমজীবি উচ্চবর্ণের লোকেরা ধর্মকে নানাভাবে তাদের জীবিকা ও প্রতিষ্ঠার বাহন হিসাবে কাজে লাগিয়েছে। তার জন্যেই ধর্মশিক্ষাকে দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষার বেড়াজালে জনগণের জীবন থেকে সুদূরে রাখা হয়েছে। বিবিধ আচার ও আনুষ্ঠানিকতার অচলায়তন গড়ে কায়েমী স্বার্থবাদী সমাজপতিরা আপন স্বার্থ সংরক্ষিত রেখেছেন। সতীদাহের আবশ্যিকতা ও বিধবাবিবাহের নিষিদ্ধকরণ যেমন পুরুষপ্রধান এ সমাজেরই স্বার্থরক্ষার একটি অপকীর্তি। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ যেমন কৌলীন্যসর্বস্ব ব্রাহ্মণদের বিনা মূলধনে আয়ের একটি নিশ্চিত পথ বলে, সমাজদেহে তার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো। জনসাধারণকে ধর্মের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এবং ধর্মকে তার যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে রামমোহন তাই ধর্মের মূলে মানবতার বাণী সংযোজিত করেন। গুটিকতক ধর্মব্যবসায়ীর রহস্যময়তা এবং অজ্ঞানতাজাত অকারণ ভীতি হতে বাঁচানোর জন্যে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি তিনি বাংলা অর্থসহ সাধারণ্যে প্রকাশ ও প্রচার করেন। তিনি যে 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) অথবা 'ব্রাহ্মসভা' (১৮২৮) স্থাপন করেন, জাতি অথবা ধর্মের বিভেদ সেখানে তত্ত্বগতভাবে, অন্তত, ছিলো না। সতীদাহ প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় নিবারিত হয় (১৮২৯ ডিসেম্বর)।

ইংরেজীশিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ রাধাকান্ত দেবের চেয়ে সম্ভবত বেশিই ছিলো, কেননা রাধাকান্ত দেব এর বৈষয়িক দিকটাই দেখে-ছিলেন, রামমোহন সেটার প্রতি সজাগ তো ছিলেনই, তদুপরি

"Rammohon Roy ··· had also an intellectual interest in it. He looked upon English education as a vehicale for Western knowledge which would, he believed, free his contrymen from

their age-old superstition and blind faith and bring their moral and cultural regeneration.[৫]

রামমোহন নিজে পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করে মোহ ও সংস্কারের পরিবর্তে যুক্তির আলোকে ধর্ম ও সমাজকে পরখ করে দেখতে চেয়েছিলেন। Bentham তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন :

Rammahan has cast off thirtyfive millions of gods and has learnt from us to embrace reason in the all important field of religion.[৬]

রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শে মধ্যযুগীয় বর্বরতা নয়, বরং য়ুরোপীয় উদারনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।[৭] কিন্তু তবু বলা যায়, লিবারেল্ইজ্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যতটা তাত্ত্বিক, বাস্তবে তিনি ততটা উদার নন।
অনেক সময় আপন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এতটা অস্বচ্ছ বলে বোধ হয় যে, তাকে প্রায় আত্মবিরোধী বলে গণ্য করা চলে। চরমপন্থী নব্যদল যাঁরা রামমোহনকে কেবল অর্ধ-লিবারেল রূপে আখ্যায়িত করেছেন, তাঁদের চোখে রামমোহন ও তাঁর অনুসারীদের স্ববিরোধ সহজেই ধরা পড়েছে। ডিরোজিও এ সম্পর্কে The East Indian পত্রিকায় লিখেছেন :

What his (Rammahan's) opinions are, neither his friends nor foes can determine. It is easier to say what they are not than what they are··· Rammahan, it is well known, appeals to the Veds, the Koran and the Bible, holding them all properly in equal estimation ··He always lived like a Hindoo···His followers, at least some of them are not very consistent. Sheltering themselves under the shadow of his name, they indulge to licentiousness in everything forbidden in the Shastras, as meal and

---

৫. Salahuddin Ahmed, পূর্বোক্ত, পৃ ২০

৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পাদটীকা, পৃ ৩৯

৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯

drink, while at the same time they fee the Brahmins, profess to disbelieve Hindooism, and never neglect to have poohjas at home [৮]

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডিরোজিওর অন্যান্য শিষ্যগণ রামমোহন রায়ের দলকে ভালো চোখে কখনই দেখেন নি, অন্ততঃ যৌবনকালে তো নয়ই। তাঁদের মতে এঁরা (রামমোহনের অনুসারীবৃন্দ) যথেচ্ছ ধনসঞ্চয় করার জন্যেই উদার নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। বিবেক-বর্জিত লোভীদের এই দল প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্ত সকল হীনতাকে বরণ করেছেন। গোঁড়াদের সামনে তাঁরা গোঁড়ার মতো আচরণ করেছেন, তথাকথিত উদারনীতিকদের সামনে উদারতার ভান করেছেন।[৯]

রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে ইয়ংবেঙ্গলদের অভিযোগ সব সত্য না হলেও, আংশিকভাবে হয়তো স্বীকার্য। এঁদের সম্বন্ধে একটি কথা অন্ততঃ বলা যায়, ধর্মের ছদ্মবেশ ও অর্থহীনতা এঁদের চোখে ধরা পড়েনি, এঁদের জীবনধারাও একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমায়িত—কলকাতার তৎকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত ধনিক ও বণিকগণই রামমোহনের 'আত্মীয়'। সাধারণের প্রবেশ সেখানে দুর্লক্ষ্য।

রামমোহনের অন্য একটি স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তীব্র প্রতিকূলতা করে তিনি আর্মহার্স্টকে দীর্ঘ একটি ঐতিহাসিক পত্র লিখেছিলেন অথচ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের পথে সংস্কৃত শাস্ত্রকেই তিনি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, রামমোহন পাশ্চাত্যকে বরণ করে নিতে গিয়ে প্রাচ্যকে ত্যাগ করেননি।[১০] বরং নবীনে ও প্রাচীনে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে প্রাচ্যের দর্শন ও ধ্যানকে সংশ্লেষিত

৮। পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৪৩ পাদটীকা

৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩

১০। শিবনাথ শাস্ত্রী; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ ঃ ৯৫

করে পুরাতনের সংস্কার সাধনের প্রয়াসী ছিলেন। এর ফলাফল এ দেশীয় সমাজ ও ধর্মজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো। বহু শতাব্দীর ধর্মকে ভাঙ্গা যত কঠিন, সংস্কার করা ততো শক্ত নয়। এ কথা পুনর্বার সত্য বলে প্রমাণিত হয় ডিরোজিওর শিষ্যদের সমাজ সংস্কারে ব্যর্থতা দৃষ্টে।

কোনো চরম পন্থায় যদিচ রামমোহন আস্থাবান নন, তথাপি তাঁর উদার চিন্তার সঙ্গে যুগপৎ রক্ষণশীলদের প্রচণ্ড প্রতিকূলতা লক্ষ্য করি। তাঁদের বাধা বিপুল, কেননা, এ যাবৎ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার দ্বারা তাঁরা উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন, কেননা, এ কাঠামো ভেঙ্গে গেলে তাঁদের নিশ্চিত আয়েশ ও তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা বিধ্বস্ত হওয়া অসম্ভব নয়। অথচ এ দলের নেতারা শিক্ষিত, এমন কি, পাশ্চাত্য ভাষা ও জ্ঞানে। সহমরণের অমানুষিকতা তাঁদের উপলব্ধির বাইরে নয়, তথাপি প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতাকে অস্বীকার করার সাহস তাঁদের নেই, পাছে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ন হয়।

সংস্কারবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল এই দুই সমান্তরাল শক্তির সাথে আর একটি শক্তি যুক্ত হলো আলোচ্য শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে। হিন্দু কলেজের ডিরোজিও[১১] ১৮২৭ থেকে ১৮৩১[১২] মোট পাঁচ বছরের চেয়েও কিঞ্চিৎ কম সময় শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি ছাত্রকে আপন মতে দীক্ষিত ঠিক করেন নি, তাঁদের সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ধর্মকে বিচার ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। ডিরোজিও এবং

---

১১. হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯–১৮৩১)

১২. 'হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নিয়োগ তারিখ, তাঁর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডস্ ১৮২৮ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ ১৮২৭ সালও বলেন। কিন্তু ১৩ মে, ১৮২৬ সালের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ "ইংরেজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডিরোজী সাহেব এই দুইজন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।" বিনয় ঘোষ. বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ ২৯৮

তাঁর শিষ্যরা যে আন্দোলনের সূচনা করেন, প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় জোড়াতালি দিয়ে সংস্কার করা তার অভিপ্রায় ছিল না, বরং পুরাতনকে পুরোপুরি ভেঙ্গে সেই ধ্বংসস্তূপের পর নবযুগের ভিত্তি স্থাপন করাই ছিলো তার মূলমন্ত্র।

ডিরোজিও যে প্রতিবেশে জাত ও লালিত তার মধ্যে একটি গ্লানি ও হতাশা ছিলো। তাঁর পিতা সদাগরি অফিসের চাকুরে ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের মতো ব্যবসা করে সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হননি। তদুপরি ফিরিঙ্গি ও ইংরেজদের মধ্যেও ব্যবধান কম ছিলো না।[১৩] ধর্মের ও বর্ণের সমতা বালক ডিরোজিওকে প্রতিষ্ঠা অর্জনে কোনোরূপ সহায়তা করেনি। তাঁর ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে সমভাবে তুলিত না হলেও তাঁর শিষ্যদের সকলের ভিতর কোনো না কোনরূপ ব্যর্থতা লক্ষণীয়। এঁদের অধিকাংশ অব্রাহ্মণ, সুতরাং সমাজে অপাংক্তেয়, আর প্রায় সকলেই নির্ধন। হতাশার একটি সমভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, ডিরোজিওর সঙ্গে এঁদের একাত্মতা সহজেই স্থাপিত হতে পেরেছিলো।

কিন্তু তবু ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদের পার্থক্য অনেক। কেননা, ডিরোজিও ফিরিঙ্গি বলে একই সঙ্গে নেটিভদের তুলনায় একটি সুবিধাজনক ও অসুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং আপন মাতৃভাষার যে শিক্ষাকে তিনি স্বীকরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন শিষ্যদের সে সুযোগ ছিলো না।

তদুপরি ডিরোজিওর পরিবারিক পটভূমিকা, বিস্ময়কর প্রতিভা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব শক্তি শিষ্যদের মধ্যে একান্তভাবে অনুপস্থিত ছিলো। সর্বোপরি ডিরোজিও এদেশে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ভাসমান শৈবালের মতো। দেশে ও সমাজে তাঁর অনিকেত দশা যত সহজে তাঁকে ভারতবর্ষীয় কুসংস্কার, ধর্ম, অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও ভাবপ্রবণার উর্ধ্বে উঠতে

---

১৩. ডিরোজিওর The East Indian পত্রিকায় একটি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হলে John Bull পত্রিকার ইংরেজ সম্পাদক Captain Macnagten কর্তৃক তাঁকে প্রহার

সহায়তা করেছিলো, তাঁর শিষ্যরা পুরোপুরি এ দেশীয় সমাজের সদস্য বলে গুরুর মতো মুক্তবুদ্ধি লাভ করা তাঁদের পক্ষে ততো কঠিন হয়েছিলো। এই কারণে দেখতে পাই, ডিরোজিওর কাছে Becon Hume, Paine, Reid, Stuart পড়ে তাঁরা যে জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তা তাঁরা আপনাপন জীবনে তেমন করে প্রতিবিম্বিত করতে সক্ষম হননি। কেননা যদি বা যৌবনের প্রারম্ভে স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য ও উদ্‌বৃত্ত উৎসাহবশত সমাজকে অস্বীকার করার দুঃসাহস কথঞ্চিৎ থাকে, কর্মজীবনে অথবা দায়িত্বযুক্ত জীবনে প্রবেশ করে পূর্বনীতির প্রতি সেরূপ অবিচল আস্থা ও প্রেরণা রাখা সম্ভব হয় না। তৎকালীন সমাজের মাঝে, ইয়ং বেঙ্গলদের চিন্তা এতো প্রাগ্রসর ছিলো যে, নীতির সাথে কিছু পরিমাণে আপোস না করলে তাঁদের জীবিকা উপার্জন অসম্ভব হতো। সামাজিক অবরোধ ও প্রতিকূলতা, তাঁদের প্রতি বহুবার এসেছে, বহুবার তাঁরা তা থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। পরিশেষে হয় খ্রীষ্টান ধর্মের ছায়ায়, নব বিশ্বাসের বিনিময়ে হিন্দু সমাজে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইয়ং বেঙ্গলদের দলটি এজন্যে ডিরোজিওর মৃত্যুর এক দশকের ভিতর ভেঙ্গে গিয়েছিলো,—পরিণতিতে সমাজে কোনো স্থায়ী আন্দোলন অথবা পরিবর্তন আনয়নের পূর্বেই।

Wordly occupations and private interests inevitably scattered in course of time the indiviual members of Derozian group for young Bengal could never develop into a movement comparable to the various trends in Europe to which the same adjective has been attached [১৪]

অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা সত্ত্বেও, অনিবার্য ও দুর্নিবার কীটের মতো তাঁরা

করার কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সেই সাথে শীলিত রুচিসম্পন্ন অসহায় এই বালক কবির ভদ্রতা প্রতিতুলনা রূপে মনে করার মতো। বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ১০৭—১০৯

১৪. Sushobhan C. Sarkar, 'Derozio and young Bengal', published in Atul C. Gupta's 'Studies in Bengal Renaissance', Jadavpur, 1958 পৃঃ ২৮

ডিরোজিওর অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিতার আলোকে আত্মবিসর্জন দিতে চেয়েছেন। নিজেদের বহু সীমাবদ্ধতা ও অসামর্থ্যের জন্যে, গুরু শিষ্যের প্রচুর আপাত ঐক্য দৃষ্ট হলেও, অমিলও কম জমে উঠেনি। শিষ্যরা প্রায়শ গুরুর অভিপ্রেত পথে শেষ পর্যন্ত গমন করেন নি। ফলস্বরূপ, ইয়ংবেঙ্গলদের ভেতর স্ববিরোধের টানাপোড়েন স্পষ্টভাবে একটি বৃহৎ ভূমিকা রচনা করেছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র[১৫] ইয়ং বেঙ্গলদের অন্যতম ছিলেন। তাঁদের কিছু সদ্‌গুণ তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন, কিন্তু জীবনের পরিণত প্রহরে বারবার তিনি শিক্ষায় ও কর্মে, ধ্যানধারণায় ও সাহিত্যে স্ববিরোধিতার অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অপর পক্ষে, ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়শনের বহু দূরে, জীবনধারা ও শিক্ষার দিক দিয়ে প্রায় বিপরীত কোটিতে অবস্থিত, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[১৬] ডিরোজিওর মুক্তবুদ্ধিকে যে কেবল আশ্চর্যজনকভাবে অঙ্গীকার করেছিলেন তা-ই নয়, বরং বহু ব্যাপারে ডিরোজিও ও তাঁর অনুসারীদের কর্ম ও চিন্তার তুলনায় প্রাগ্রসর হয়েছিলেন। এর কারণ নির্ণয় করা সম্ভব।

প্যারীচাঁদ ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় সমবয়স্ক, তদুপরি লেখাপড়া শিখেছেন এবং কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন একই নগরীতে। স্থান, কাল ও সমাজের এ সমতা সত্ত্বেও, ধ্যানধারণায় প্যারীচাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যবধান দুস্তর, এমন কি, বলা চলে, তাঁরা প্রায় বিপরীত। অন্যান্য বিষয়গুলো যখন কমবেশি অভিন্ন, তখন তাঁদের ব্যক্তিমানস গঠনে পরিবার ও প্রতিবেশ নিশ্চয় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্যারীচাঁদ ও বিদ্যাসাগরের পারিবারিক পরিচয় এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হতে পারে।

বনেদি পরিবারের সন্তান না হলেও, প্যারীচাঁদের জন্মকালে তাঁদের পরিবার কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর পিতামহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। ইংরেজদের সঙ্গে

১৫। প্যারীচাঁদ মিত্র (২২ জুলাই ১৮১৪—২৩ নবেম্বর ১৮৯৩)

১৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০—২৯ জুলাই ১৮৯১)

ব্যবসাবাণিজ্য করে যথেষ্ট বিত্ত অর্জন করেন তিনি। আপনপুত্র প্যারীচাঁদের পিতাকে সযত্নে দিয়েছিলেন ইংরেজীশিক্ষা। তার গুণে পুত্র মনে মনে রীতিমতো পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। অপর পক্ষে, 'কোম্পানির কাগজ, হুণ্ডী প্রভৃতির ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর ধনোপার্জন করিয়াছিলেন'[১৭] ইংরেজি বিদ্যা এবং বিত্তের বলে রামনারায়ণ তৎকালীন কলকাতার অভিজাতদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আভিজাত্যের মাপকাঠিই তো ছিলো বিত্ত এবং বিদ্যা।

বাল্যকালে বাংলা ও ফারসি শেখেন প্যারীচাঁদ। অতঃপর ইংরেজী শিক্ষার জন্যে তিনি হিন্দু কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৮২৭ সালে। ডিরোজিও তখন এ কলেজের শিক্ষক। তাঁর আকর্ষণ ছিলো চুম্বকের মতো অমোঘ।[১৮] অতএব তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্যারীচাঁদও স্বভাবতই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী হিন্দু কলেজের এই সমস্ত প্রতিভাবান ছাত্রদের সঙ্গে প্যারীচাঁদও যেতেন ডিরোজিওর বৈঠকখানায় আলোচনা সভায় যোগ দিতে। ডিরোজিওর সাথে প্যারীচাঁদের যোগাযোগ যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠ ছিলো তার আর একটি প্রমাণ, প্যারীচাঁদের ইংরেজি পাঠশালার পরিদর্শকদের মধ্যে ডিরোজিও ছিলেন অন্যতম।[১৯] ইয়ংবেঙ্গলদের সহিত অন্তরঙ্গতার ফলস্বরূপ প্যারীচাঁদের উপর কী ধরণের প্রভাব পড়া সম্ভব, ইয়ংবেঙ্গলদের কার্যধারা আলোচনা করলেই তা বোধগম্য হতে পারে।

১৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, কলিকাতা, ১৩৬২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৫

১৮। শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত পৃঃ ৯৮—৯ অধিকন্তু, বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, পৃঃ ৪৬

১৯। শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৯

ধর্ম সম্বন্ধে ডিরোওজিওর অনাসক্তি সুবিদিত ছিলো। মৃত্যুর পরে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে The Indian Register পত্রিকা লিখেছিলেন: That he did not view Christianity as a communication from the divinity to fallen man is well-known.[২০] মৃত্যুর পূর্বে পাদ্রী হিল ধর্মবিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে, তিনি বলেছিলেন, 'ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে চূড়ান্ত সত্য কি তা আজও আমি জানি না। আমার অনুসন্ধান শেষ হয়নি এখনও।[২১] জীবদ্দশায় ছাত্রদের তিনি নাস্তিক্যের শিক্ষা দেন নি বটে, কিন্তু মুক্তমন নিয়ে ধর্মকে বিশ্লেষণ করার প্রেরণা দিয়েছেন। চাকুরী চলে গেল, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের অভিযোগের উত্তরে এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'ভেবেছিলাম তাঁদের (ছাত্রদের) একদল গোঁড়া আপ্তবাক্যবাদী অন্ধবিশ্বাসী তৈরী না করে সত্যিকার সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরী করব।...তরুণদের মনে কোন নির্দ্দিষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করা কোনদিন আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং সেটা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার'।[২২] দৃষ্টির আচ্ছন্নতা অন্তে, ডিরোজিওর শিষ্যরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও আচার অনুষ্ঠানের নিরর্থক অন্ধতা ও নিষ্ঠুর প্রাণহীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করলেন। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত করেন। The Parthenon[২৩], The Enquirer[২৪], জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে তরুণরা তাঁদের চিন্তা ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে থাকেন।

২০। বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিওতে উদ্ধৃত, পৃঃ ১২৮

২১। পূর্বোক্ত

২২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮—৯

২৩। প্রকৃতপক্ষে কলেজ ম্যাগাজিন। একটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিলো (১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০)। এ পত্রিকা সম্বন্ধে The India Gazette বলেছেন, জন্মগত-ভাবে হিন্দু ও শিক্ষায় য়ুরোপীয়দের পত্রিকা এটি। salahuddin Ahmed, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০—১

২৪। পত্রিকা সম্পাদক কৃষ্ণমোহন পত্রিকার উদ্দেশ্য জানিয়ে বেন্টিঙ্ককে লিখেছিলেন, With the intention of making an attempt to eradicate prejudice from the Hindoos, my countrymen, I have been for the last 4 or 5 months editing a news paper under the title the Enquirer, Salahuddin Ahmed, পূর্বোক্ত, পৃ ৭১ পাদটীকা

ডিরোজিও পরিচালিত অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন ও অন্যান্য আরো সাতটি সভা ডিরোজিও যে গুলোর সদস্য ছিলেন, এবং উল্লিখিত পত্রিকাসমূহে বারংবার হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, আচারের সঙ্কীর্ণতা এবং সমাজের অত্যাচারের কথা আলোচিত হয়েছে। সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল থেকে মুক্তির জন্যে পুনঃপুন বিদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাঁদের সভায়ঃ

The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed, and condemned, and angry disputes were held on moral subject, sentiments of Hume had been widely deffused and wormly patronised. Reason was now promoted to be a God, and custom voted to be the idol of fools...... the Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of regard of rational being. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state and it was then resolved that nothing but liberal education could enfanchise the minds of the people[২৫]

এঁদের পত্রিকায় লেখা হতোঃ

Persecution is high for we have deserted the shrine of Hinduism. The bigotes are violent because we obey not the call of superstition...We have attacked Hinduism and will persevere in attacking it until we finally seal our triumph.[২৬]

প্যারীচাঁদের ভাষায়, 'ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না, অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত, অনেকে সন্ধ্যা আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা

২৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ ১০২ ও Salahuddin Ahmed, পূর্বোক্ত পৃ, ৪২
২৬ বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, পৃ ১০৪; The Enquirer থেকে উদ্ধৃতি।

বসিয়া সন্ধ্যাআহ্নিকের পরিবর্তে হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।[২৭]

ডিরোজিওর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যতীত, এই অনাচারী ইয়ং-বেঙ্গলদের সাথে প্যারীচাঁদ নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কৃষ্ণমোহন প্রমুখের মতো তিনি যে কেবল একপালকের পাখি ছিলেন তা-ই নয়, তাঁদের প্রকাশিত 'জ্ঞানাণ্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকার সম্পাদকীয় পরিষদের ও নিয়মিত লেখকবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে স্থাপিত The Society for the Acquisition of General knowledge, The Calcutta Society for the prevention of cruelty to Animals, The Bengal Science Association, The Agri-horticultural Society, The District charitable Society. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে তিনি ইয়ংবেঙ্গলদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। 'মাসিক পত্রিকা' নামে যে সাহিত্য সাময়িকীটি তিনি প্রকাশ করেন তা-ও ইয়ংবেঙ্গলদের একজন—রাধানাথ শিকদারের সহযোগে।

প্যারীচাঁদের মানসগঠনে সামগ্রিকভাবে হিন্দু কলেজের প্রভাবও সম্ভবত কম ছিলো না। তৎকালে হিন্দু কলেজে ধর্মীয় শিক্ষা দূরে থাকে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যও পড়ানো হতো না। পাশ্চাত্যজ্ঞানবিজ্ঞান দেশীয়দের মধ্যে বিতরণ করাই ছিলো এ কলেজ স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য।[২৮] ডিরোজিও যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন ১৮৩০—৩১ সালের মধ্যে, তার ফলে পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজের এই ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চ্যাত্য শিক্ষা-দর্শ অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলো। কিন্তু প্যারীচাঁদ ধর্মীয় গোঁড়ামিবর্জিত শিক্ষা হিন্দু কলেজে লাভ করেছিলেন। বাল্যকালেও তিনি সংস্কৃতের বদলে পড়েছিলেন বাংলা ও ফারসি।

---

২৭ শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, ১০২, ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত থেকে উদ্ধৃতি।

২৮ বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, পৃ, ৮৮

কিন্তু প্রগতিশীল শিক্ষা এবং ডিরোজিও ও বন্ধুদের প্রাগ্রসর চিন্তা প্যারীচাঁদের মনে স্থায়ী ও গভীর কোনো ছাপ অঙ্কিত করেছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। কেননা ইয়ংবেঙ্গলদের অনেকের প্রথম জীবনের গুণগুলো—সততা, সত্যবাদিতা, সৎসাহস, সমাজসেবার আদর্শ—তিনি লাভ করেছিলেন বটে, তথাপি তাঁদের সংস্কারবিমুক্ত মন তাঁর ছিলো না। এ কারণে কর্মজীবনে প্রবেশ করেই, দেখতে পাই, তিনি অন্যান্য অনেক বন্ধুর মতোই আপনাকে স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে, সমাজের অঙ্গীভূত করেছেন। এর কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ফলস্বরূপ প্রচলিত ধর্মের জঘন্য সংস্কার ও আচারের প্রতি অবিচল আস্থা, এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিধাতার অভিপ্রেত অপরির্তনীয় বলে মনে করার প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করি। প্যারীচাঁদ বাস্তবিকপক্ষে বিষয়ী লোক ছিলেন। আমদানি রপ্তানি কাজের জন্যে কালাচাঁদ শেঠ অ্যাণ্ড কোং নামে একটি সংস্থার প্রথমে তিনি অংশীদার ও পরে পুরোপুরি মালিক ছিলেন। এ ছাড়া গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল কোং, হাওড়া ডকিং কোং, পোর্ট কানিং ল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং, বেঙ্গল টী কোং, ডারাং টী কোং প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর বিত্ত অর্জন করিয়াছিলেন।[২৯] কিন্তু বিষয়ের প্রতি এতৎ পরিমাণ অনুরক্ত থাকা সত্ত্বেও, তাঁর রচিত সাহিত্যের মূলসুর আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরচিন্তা ও নীতি ধর্মের প্রচার। প্যারীচাঁদের মধ্যে অভ্রান্ত একটি স্ববিরোধ, অন্যান্য ইয়ংবেঙ্গলদের মতোই, অনায়াসে লক্ষ্যগোচর হয়।

আবাল্য যিনি ইংরেজি শিক্ষায় মনোযোগী, ডিরোজিওর মতো মুক্তবুদ্ধি প্রগতিবাদীর যিনি অনুসারী, যে ইয়ংবেঙ্গলরা বলতেন, If there

২৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭০—৮০

is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism,[৩০]

তাঁদের যিনি বন্ধু, ব্যবহারিকজীবনে, পোষাকে, রুচিতে, যিনি পাশ্চাত্য-প্রভাবিত, ধর্মসম্বন্ধে যিনি প্রভূত অধ্যয়ন করেছেন, তিনি কি করে সহমরণের সমর্থক অথবা বিধবাবিবাহের বিরোধী। সহমরণের প্রতি তাঁর উৎসাহ প্রকাশ পায় 'অভেদী' উপন্যাসের একটি স্থানে। সহমরণের একটি দৃশ্য বর্ণনায় তাঁর উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করবার মতো।

> পরে অনেকে নিকটে আসিয়া ওই স্ত্রীলোককে নানাপ্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই উত্তর না দিয়া করজোড়ে ঊর্ধ্ব-দৃষ্টে থাকিলেন। নিকটস্থ লোকদের বোধ হইল যেন তাঁহার আত্মা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব বলে শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে আত্মাতে বাহ্যভাব কিছুই প্রেরিত হইতেছেনা। অল্পকাল পরে শব স্নাত হইলে তিনি প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনামের ধ্বনি করতঃ মৃত ভর্তার চিতায় আরূঢ় হইয়া যেন স্বর্গ লাভ করিলেন। রমণীর জীবিত শরীর মৃত স্বামীর শরীরের সহিত দগ্ধ হইতে লাগিল—দেহ স্থৈর্য্যে সম্পূর্ণ—দুই হস্ত সংযুক্তবদন ঈষদ্ধাস্যান্বিত —নয়ন সমাধিতে আবৃত্ত ও যদবধি আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল, তদবধি তাঁহার পবিত্র রসনার হরিনাম সকলের শান্তিদায়ক হইয়াছিল।[৩১]

৩০। মাধব মল্লিকের উক্তি। মনে হয় একাধিক বার লিখিতভাবে তিনি এ মত প্রকাশ করেছিলেন। একবার কলেজ ম্যাগাজিন Parthenon এ (শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে মতে Athenium-এ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃঃ ৮৭) এবং আর একবার The Bengal Hurkure-র সম্পাদকের কাছে লিখিত চিঠিতে। সেখানে ভাষাও ভিন্ন। (If there be anything under Heaven that either I or my friends look upon with most abhorrance, it is Hindooism.) Salahuddin Ahmed, পূর্বোক্ত গ্রন্থ উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৯

৩১। অভেদী, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ঢাকা, ১৯৬৮, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত পৃঃ ৪৪১।

সহমরণের সমর্থনের মতো বিধবাবিবাহের প্রবল প্রতিকূলতা প্যারীচাঁদের সাহিত্যকর্মে লক্ষ্যযোগ্য।[৩২] তাঁর 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাসে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে পাত্রপাত্রীরা বলেছে :

> এই ভারতভূমিতে পাতিব্রত্য ধর্ম যেরূপ বদ্ধমূল, এমন আর কোন দেশে নাই। এ দেশে পতি জীবিত অবস্থায় সাকার পতি, মৃত্যু হইলে নিরাকার পতি। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসে এই পতিকে হৃদয়ে জাগ্রত করা ও নিরাকার রাজ্য ও নিরাকার রাজ্যেশ্বরকে ধ্যান করাই ব্রহ্মচর্য্য।[৩৩]

অপর পক্ষে, মুসলমানদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকার কারণ :

> মুসলমানদিগের ইন্দ্রিয়সুখ অধিক, তাহাদিগের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ভিন্ন প্রকার, পারলৌকিক ভাব অল্প। উহারা রোজাতে উপবাস করে, কিন্তু উহাদিগের স্বর্গ ইন্দ্রিয় সুখ সংযুক্ত। আমাদিগের স্বর্গ বিমল আনন্দে ব্যাপক।[৩৪]

কর্ম ও চিন্তায়, শিক্ষা ও ভাবনায় অনৈক্য প্যারীচাঁদে অন্যত্রও দেখা যায়। তিনি ছাত্রজীবনেই সাধারণ্যে ইংরেজি শিক্ষা ব্যাপ্ত করার উদ্দেশ্যে আপন গৃহে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, অথচ পরিণতজীবনে বিদ্যাকে গণমুখীন করার সদিচ্ছা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত বলে মনে হয়। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন বটে, তথাপি শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর উৎসাহ ছিলো এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি যে সংসদগুলোর সক্রিয় সদস্য ছিলেন, পশুর ক্লেশ নিবারণ থেকে শুরু করে কল্পিত আত্মার উন্নতিবিধান তাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে

৩২। কর্মজীবনে কিন্তু পুনরায় একটি স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করি : বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের সপক্ষে যে স্বাক্ষর সংকলিত আবেদন পত্র সরকারের কাছে প্রেরণ করেন, তাতে প্যারীচাঁদের স্বাক্ষর ছিলো।

৩৩। প্যারীচাঁদ রচনাবলী, পৃঃ ৫৩৭, পুনরায় ৫৪৬ পৃষ্ঠায় একই জাতীয় অন্য একটি মন্তব্য আছে।

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩৭

এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনটাই সাধারণ মানুষের দুঃখমোচনের অথবা শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্যে নিয়োজিত নয়। গণবিমুখতা, দেশের নাড়ী ও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ইয়ংবেঙ্গলদের প্রায় সকলের ভেতর, সমভাবে লক্ষণীয়। তা ছাড়া, যে অর্থনীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী, তা স্মিথীয় **(Adam Smith)** ধনতন্ত্রের পর প্রতিষ্ঠিত। অবাধ বাণিজ্য করে অমিত বিত্ত ব্যক্তির হস্তে সঞ্চিত হোক, তৎকালীন ইংরেজ ও এ দেশীয় ব্যবসায়ী, বেনিয়ান ও জমিদারদের সঙ্গে তাঁরাও এ মতের পোষক ছিলেন।[৩৫] সমাজের গভীরে তাঁদের মনের শিকড় প্রোথিত, তার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে আত্মহননের দুঃসাহস তাঁদের সচেতন মননে ছিলো না। কিন্তু ধর্মকে আঘাত দিয়ে, কৌলিন্যকে মূলহীন প্রতীয়মান করে বিদ্যা ও বিত্তের সহায়তায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মনে প্রবল ছিলো। কোম্পানির শাসনের পরিবর্তে ভারতবর্ষ পুরোপুরি ব্রিটেনের উপনিবেশে পরিণত হোক, সমকালীন অন্যান্য শিক্ষিত ও বিত্তবানদের মতো তাঁদের এই কামনা, এ দলের স্ববিরোধের আর একটি নমুনা। সমূহ লাভের কথা ভাবলেন, অথচ ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর দৃষ্টি তাঁদের ছিলো আচ্ছন্ন। সুশোভন সরকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন :

> **Many of Young Bengal's true limitations were not peculiarly its own but shared by our entire Reneissance. The educated community of the 16th century failed to understand exploiting character of the alien British rule in India, looking mainly at its immediate benefits, the protagonists of our 'awakening' had little contact or understanding of the toiling masses who lived in a world apart, the obsession of the Hindu traditions and life kept at a distance the community of our Muslim fellow citizens.**[৩৬]

৩৫। Salahuddin Ahmad পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২—৪৩

৩৬। Susobhan C. Sarker, পূর্বোক্ত পৃ ৩০—৩১

এ দলেরই অন্যতম, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৌতুকজনক নিশ্চয়, সাধারণ মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব বেবাক এড়িয়ে গিয়ে হঠাৎ স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য —বিশেষত আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য—অত্যুৎসাহী হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে তিনি 'রামারঞ্জিকা'' 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্বাবস্থা'ও 'বামাতোষিণী' নামক তিনখানা পুস্তক রচনা করেন। এও তাঁর পূর্বোক্ত বিপ্রতীপ ভাবের স্বাক্ষর, কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ তাঁর জনবিমুখ কার্যকলাপের সঙ্গে।

সামগ্রিকভাবে ইয়ংবেঙ্গলদের এবং বিশেষভাবে প্যারীচাঁদের স্ববিরোধ-সমূহের অন্তর্নিহিত কারণগুলো রহস্যময় বলে বোধ হলেও, খুঁজে বের করা কঠিন নয়। ইয়ংবেঙ্গলরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে কঠিন হস্তে আঘাত করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন, তার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে তাঁরা যে পরিমণ্ডলে জাত ও লালিত, তা তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান করেনি। Ralph Linton এর একটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

> New social inventions are made by those who suffer from the current conditions, not by those who profit from them.[৩৭]

প্যারীচাঁদ ও তাঁর বন্ধুদের পরস্পরবিরোধী ধারণাসমূহের কারণ লুকিয়ে আছে প্রধানতঃ এই একটি সূত্রে।

ইয়ংবেঙ্গলদের পারিবারিক, কালিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁরা অধিকাংশ অকুলীন। অকুলীন বলেই ধর্মের প্রতি তাঁদের আনুগত্য যথেষ্ট নয়, কেননা ধর্ম তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করেনি। ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী ও রাধানাথ শিকদার ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, তাঁদের আর্থিক অবস্থা আবার যথেষ্ট খারাপ ছিলো। ব্রাহ্মণ্যের মূল্যহীনতা এবং বিত্তের যথার্থ মূল্য দৃষ্টে, এরাঁও আপন ধর্ম সম্বন্ধে নির্মোহ ছিলেন।

৩৭। Ralph Linton, The cultural Background of personality. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৬, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ২৮

ইয়ংবেঙ্গলদের বিদ্রোহের প্রধান হেতু অবশ্য তাঁদের অর্থনৈতিক দৈন্য। এই মেধাবী ছাত্রবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে পরিবারের দারিদ্র্য ও তার দরুণ সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাব দেখেই ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার প্রতি বিরূপ হতে পেরেছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষা এ বিষয়ে হয়তো তাঁদের যথার্থ পথ দেখিয়েছেন। অন্যথায় তাঁরা বোধহয় পূর্বপুরুষদের মতোই দারিদ্র্য ও সামাজিক বিধানকেই নিয়তি বলে মেনে নিয়ে 'সর্বশক্তিমান' 'পরম করুণাময়' অদৃশ্য শক্তির প্রতি সমধিক পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত হতেন।

ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের সাথে প্যারীচাঁদের যোগাযোগ অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ রকমের ছিলো, আগেই তা বলা হয়েছে। তথাপি ইয়ংবেঙ্গলদের নাম উল্লেখিত হলে সাধারণত প্যারীচাঁদের কথা দেরিতে উঠে। তার কারণ, প্যারীচাঁদ এঁদের সাথে বাহ্যিক যোগ যতটা ঘটিয়েছিলেন, আত্মিক যোগ ততটা অনুভব করেন নি। না করারই কথা। কেননা, বিত্তবান পরিবারের তিনি প্রতিনিধি, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও ছিলো তাঁদের। অর্থকরী বলেই তিনি প্রথমে শিখেছিলেন ফারসি, কিন্তু যুগের হওয়া পরির্তিত হওয়ায় হিন্দু কলেজে এসেছিলেন ইংরেজী অধ্যয়ন করতে, সে-ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধের কথা চিন্তা করে। তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুরা ছেলেদের ইংরেজী শেখাতেন এই দিকে লক্ষ্য রেখে, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ডিরোজিওর শিক্ষা সেহেতু তাঁকে আকৃষ্ট ও কৌতুহলী করলেও, চিরাচরিত সংস্কার ও আচারের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেননি।

এ কথা মনে রাখা আবশ্যক, আমরা যা কিছু অধ্যয়ন করি, তার সবকিছু আমাদের আত্মাকে উদ্‌বোধিত অথবা আলোকিত করে না। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ উক্তির যাথার্থ্য স্বীকৃত হবে। আমরা ডিগ্রি পাই, কিন্তু জ্ঞানার্জন করি না, আমরা শিক্ষিত হই কিন্তু পরিশীলিত রুচির অধিকারী হই না। প্যারীচাঁদ যদি **Becon, Hume, paine, Locke,** পড়েও মুক্তিবুদ্ধি লাভ না করে থাকেন, প্রচলিত সংস্কারের প্রতি তাঁর আস্থা বিচলিত না হয়ে থাকে বিস্মিত হলেও, অবিশ্বাস করার কারণ নেই।

ছাত্রজীবনে, এমন কি, তার অব্যবহিত পরেও প্যারীচাঁদের সঙ্গে প্রতিবাদী ও প্রগতিবাদী আন্দোলনের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্বান হিসেবে, সাহিত্যিক হিসেবে, চিন্তাশীল হিসেবে, সমাজনায়ক হিসেবে এবং সর্বোপরি বিত্তবান হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভের পর তাঁর অতীতমুখী মানসিকতা আর চাপা থাকে নি। 'আলালের ঘরের দুলাল' অথবা 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' গ্রন্থ দুটির উপজীব্য যদিচ নিরঙ্কুশ ভাবেই নীতিকথা ও স্বাজাত্যাভিমান, তথাপি তার মধ্যে যেটুকু ছদ্ম প্রগতিবাদ আছে, তা-ও নিঃশেষিত পরবর্তী রচনা সমূহে। সেখানে তাঁর সঙ্গে রাধাকান্তদেবের কোনো বিরোধিতা নেই। তখন সতীদাহের সমর্থন কিংবা বিধবাবিবাহের নিন্দায় তিনি সোচ্চার। আধ্যাত্মিকতা ও প্রেততত্ত্বের চর্চায় তিনি ঐকান্তিক, কেননা বৈষয়িক উন্নতির চরমে উঠে, বিষয়চিন্তা থেকে তিনি বিমুক্ত।

বিদ্যাসাগর কুলীন ব্রাহ্মণবংশের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেছেন ধর্মশাস্ত্র ও প্রাচীন সাহিত্য, যে সমাজে তিনি লালিত তা ধর্মীয় আচারে সম্পৃক্ত—ইয়ংবেঙ্গলদের সঙ্গে বিত্তহীনতা ব্যতীত অন্য কোনো সাদৃশ্য নেই, অবশ্য এ ব্যাপারেও তিনি পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক বেশী দরিদ্র। ইয়ংবেঙ্গলগণ ডিরোজিওর মতো বিমুক্তমনের অধিকারী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিতাবিশিষ্ট একজন শিক্ষকের নিকট দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, সামাজিক ও শিক্ষাগত status-এর অভাবে বিদ্যাসাগরের পক্ষে না অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন না ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হওয়া সম্ভব ছিলো। এমন কি, তাঁদের মতো ইংরেজি শিখে পাশ্চাত্যের মনীষীদের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও তিনি ছাত্রজীবনে পান নি। একান্তভাবে সনাতন সমাজব্যবস্থাকে মেনে, কৌলীন্যের আস্ফালন করে আর ধর্মীয় বিধান দিয়ে দিনযাপনই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হতো।

কিন্তু এর বদলে দেখতে পাই, সামাজিক অচলায়তনকে রূঢ় আঘাতে ধূলিসাৎ করতে তিনি প্রয়াসী। দ্বিতীয়ত, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি এত অনীহ যে, তাঁকে প্রায় নিরীশ্বর বলে মনে করা সঙ্গত। তৃতীয়ত, আবাল্য যে প্রাণহীন ও অর্থহীন শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন, তাকে আমূল পরিবর্তিত করার চেষ্টায় তিনি একনিষ্ঠ। চতুর্থত, তথাকথিত প্রগতিবাদী ইয়ংবেঙ্গল-দের উল্টো, তিনি শিক্ষাকে সার্বজনিক করতে প্রযত্নবান। সর্বোপরি, তাঁর চিন্তা মানবমুখিন এবং তাঁর কার্য গণকেন্দ্রিক।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই অত্যাশ্চর্য রূপায়ণের কারণ আপাতবিচারে দুর্লক্ষ্য হলেও, সে রহস্য অনাবিষ্কৃত থাকে না। পূর্বে লিম্‌টনের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, সে কথা স্মরণ করে পুনরায় বলা যায়, যে প্রতিবেশে তিনি লালিত তা থেকে লাভবান হননি বলেই, তিনি তার মূল্যহীনতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তার সংস্কার করে নতুন পরিবেশ গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আর্থিক দৈন্য তাদের প্রায় পুরুষানুক্রমিক। তাঁর পিতামহী তাঁর পিতাকে খাওয়াতেন চরকার সুতো কেটে। আর তাঁর পিতা বয়ঃসন্ধিকালে কলকাতার রাস্তায় অভুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, ফলার করেছেন এক দরিদ্র বিধবা পসারিণীর দয়ায়। অর্ধাশনে দীর্ঘকাল কাটিয়ে যখন শেষ পর্যন্ত, দু'টাকা বেতনের চাকুরী পান তখন তিনি বিলক্ষণ আহ্লাদিত হন। [৩৮] বালক বিদ্যাসাগর নিজেও কলকাতার বাসায় আপন হাতে রেঁধে খেতেন, নানারূপ অর্থকৃচ্ছ্রতায় তখনো তার পিতা ছিলেন বিপর্যস্ত। পুত্রের 'বৃত্তি' পর্যন্ত পরিবারের পক্ষে আর্থিক সহায়তার কারণ হয়েছিলো। দরিদ্র হলেও একটি বিষয়ে তাঁর পরিবার অমিত বিত্তের অধিকারী ছিলো, তাই উত্তরাধিকার সূত্রে রিক্‌থ হিসেবে অর্সে ছিলো ঈশ্বরচন্দ্রের পর। তাঁর পিতামহের প্রবল

৩৮। বিদ্যাসাগরচরিত (স্বরচিত), প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ এবং মাতার ঔদার্য, করুণা ও মানবিকত_ প্রভুত পরিমাণে তাঁর চরিত্রে লক্ষনীয়। দয়া, উদারতা, সহানুভূতি বিদ্যাসাগরের সহজাত ছিলো। তদুপরি এ গুণাবলীর সঙ্গে সীমাহীন তেজ, কিছুতেই-হার-না-মানার অপরাজেয় শক্তি যুক্ত হয়েছিলো।[৩৯]

আপন পরিবারে ও প্রতিবেশে বিদ্যাসাগর দারিদ্র্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ করেছিলেন ধর্মের সহস্র বিকার।

বিদ্যাসাগর জন্মে ছিলেন কৌলিক সংকীর্ণতার গভীর অন্ধকারের মধ্যে। তাঁর বাল্যপরিবেশে আলোর ক্ষীণ রশ্মিও ছিল না কোথাও। যজন যাজন, গুরুতা অধ্যাপনার সনাতন কুলবৃত্তির শোচনীয় অর্থনৈতিক ও মর্মান্তিক সামাজিক পরিণতি তিনি নিজের পারিবারিক জীবনেই দেখেছিলেন।[৪০]

উৎপাদনকার্যে ব্রাহ্মণদের ঐকান্তিক নিষ্ক্রিয়তা ও সম্পূর্ণরূপে পরশ্রমজীবিতার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণরা আর্থিক দুর্গতির চরমে পৌঁছেছিলেন। ধর্ম ও আচারের দোহাই দিয়ে পৌরোহিত্য ও গুরুতা করে অন্নসংস্থান করা ও সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা, বিশেষত পরিবর্তিত যুগের প্রেক্ষিতে, আর সম্ভব হলো না।

তিনি দেখেছিলেন, ব্রাহ্মণ্যের বা কৌলিন্যের মর্যাদা ফাঁপা হয়ে গেছে, কারণ তার কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। যে মর্যাদার আর্থিক ভিত্তি নেই, অতীতে তার কোন অর্থ থাকলেও, বর্তমানে তা অর্থহীন। তার জন্যই প্রধানত কৌলিন্যপ্রথা বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথার উদ্‌ভাবন প্রয়োজন হয়েছে, অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপে। কঠোর জীবন সংগ্রামের সমাধান করেছেন ব্রাহ্মণরা কৌলীন্য ও অন্যান্য প্রথার আশ্রয়ে! তার অর্থনৈতিক বাস্তবটাই রূঢ় ও বড় সত্য, ধর্ম ও শাস্ত্র অর্ধ সত্য মাত্র।[৪১]

৩৯। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর চরিত, রবীন্দ্ররচনাবলী ৪, পৃ ৪৮৩, ৪৮৭

৪০। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালীসমাজ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩২

৪১। পূর্বোক্ত, পৃ ৩২–৩

পীড়ন ও শোষণ যত নির্মম হবে, তার প্রতিক্রিয়াজাত বিদ্রোহও তত প্রচণ্ড হতে বাধ্য। আপন পরিবার ও পরিবেশে ধর্মের অমানুষিক সংকীর্ণতা ও বিপুল বিকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই, এর বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহ ও সংস্কার প্রয়াস এমন প্রবল।

ঈশ্বরচন্দ্র যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা ছিলো নিতান্তই চিরাচরিত। যে সংস্কৃত কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে, তা একপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরই সৃষ্টি। ইংরেজরা চেয়েছিলেন প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে কায়েমি করে যুগপৎ শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের দানশীলতা ও উৎসাহ সপ্রমাণ করতে এবং অতীতমুখী শিক্ষা বিকীর্ণ করে উপনিবেশকে চিরদিন মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে। অপর পক্ষে, দেশীয় নব্যশিক্ষিত ও বিত্তবানরা শাস্ত্রীয় ও দেবভাষার শিক্ষাকে পাকা করে সমাজে আপনাপন প্রতিষ্ঠাকে চিরস্থায়ী করতে। যেহেতু তারা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে এবং ইংরেজীতে শিক্ষিত হয়ে সমাজ জীবনে অপরিহার্য গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন, তার জন্যেই ইংরেজী শিক্ষার আর বেশী সম্প্রসারণ না হলে, তাঁদের নেতৃত্ব অপ্রতিদ্বন্দ্ব থাকে এবং তার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটলে সংস্কারাচ্ছন্ন জনগণকে শাসন করা সহজসাধ্য হবে। অতীতমুখী শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় এবং যুগের পক্ষে অনুপযোগী, রামমোহন তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই আর্মহার্ষ্টকে লেখা তাঁর বিখ্যাত পত্রে এ কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বিষয়বস্তু একান্তভাবে পৌরাণিক, একমাত্র প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত, উপযোগিতার মাপে, অন্য কিছু পাঠ্য ছিলো না। প্রাচীন দর্শন নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অ্যাকাডেমিক মূল্য ছাড়া তার গৌরবের আর কিছু ছিল না। সমকালীন য়ুরোপ চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তুলনায় এত অগ্রসর ছিলো যে, আপেক্ষিকভাবে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন অথবা স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন, হাস্যকর রকমের কালাসঙ্গতি। মনে রাখা আবশ্যক, আলোচ্য

কালের পূর্বেই ফরাসী বিপ্লব অথবা শিল্প বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এ দেশেও য়ুরোপীয় লিবারেলিজমের হাওয়া লেগেছিলো। রামমোহন তারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন :

The enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful. [৪২]

ডিরোজিওর অধ্যাপনায় কলেজস্কোয়ারের অন্য কয়েকটি উৎসাহী বালক সমকালে লিবারেলিজমের দর্শনে দীক্ষিত হচ্ছিলেন। তারপর

ডিরোজিও ও রামমোহনের মৃত্যুর পরে ইয়ংবেঙ্গলদের তরী যখন ঘূর্ণিবাত্যায় সমাজবক্ষে টলটলায়মান, কৃষ্ণমোহন ও তাঁর কয়েকজন তরুণ বন্ধু যখন তার কাণ্ডারী, তখন ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যশ্রেণীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ছাত্র। বাংলার নব্য ইংরেজী শিক্ষিত তরুণরা যখন বেকন, লক, হিউম, ভলটেয়ার, টমপেইন পড়ছেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রিয় অধ্যাপকের কাছে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা ইত্যাদি সাহিত্য রসভাণ্ডার আস্বাদন করেছেন। [৪৩]

বিদ্যাসাগরের অধীত বিষয় এবং অধ্যাপক উভয়ই পূর্ববর্তিদের তুলনায় সেকেলে। যে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক বালক ঈশ্বরচন্দ্র, সমাজ গঠনে তার গুরুত্ব ও নব্য য়ুরোপীয় দর্শনের ভূমিকা দুস্তর ব্যবধান রচনা করে। আবার ডিরোজিও সমসাময়িককালের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহী, পোষক ও প্রচারক নবতম মতাদর্শের, অন্যদিকে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ধর্ম সভায় সদস্য, প্রতিক্রিয়াশীলতায় প্রবল ও যুক্তিবর্জিত। ধর্মসভা পত্তনের ইতিহাস প্রসঙ্গত উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলে, রক্ষণশীল সমাজ ও ধর্মীয় নেতারা পরের জানুয়ারী মাসে এ সভা স্থাপন করেন। রামমোহন ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যপন্থী সংস্কার প্রচেষ্টা এবং ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে ভাঙ্গার

৪২। Salahuddin Ahmed, পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৩৯

৪৩। বিনয়ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২১৫ - ৬

প্রচণ্ড আঘাত উভয়ের সম্মুখীন হওয়ার জন্যেই এ সভার সৃষ্টি। গগনভেদী চীৎকার আর দর্পভরা আস্ফালনের জন্যই এ সভা সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ছিলো 'গুড়ুম সভা'রূপে।[৪৪] বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ শিক্ষকই এ সভার সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল পণ্ডিতদের শিষ্য ও অতীতমুখী বিষয়বস্তুর পাঠক হিসেবে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে সঙ্কীর্ণ, সংস্কারাচ্ছন্ন ও অনুদার এক টোলো পণ্ডিতে পরিণত হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আশ্চর্য এক ব্যতিক্রমরূপে গণ্য হয়েছেন। তাই দেখতে পাই পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হিসেবে অসঙ্গতিপূর্ণ পাঠক্রম ও কলেজের অন্যান্য নিয়মকে তিনি দুঃসাহস ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে সংস্কৃত করতে পেরেছিলেন। শিক্ষাদর্শের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মুক্তচিন্তার অধিকারী, তার কারণ বাল্য ও যৌবনকালে একপেশে একটি শিক্ষাযন্ত্রের নিচে তাঁর প্রাণোচ্ছল মন নিষ্পেষিত হয়েছিলো। যে দর্শন মানুষের হৃদয়কে অপ্রাকৃতে আস্থাশীল করে অথবা অতীতের মায়াজালে বন্দী করে, ভারতীয় কিংবা য়ুরোপীয় যা-ই হোক না কেন, তাকে তিনি ছাত্রদের পাঠের অনুপযোগী বলে বিবেচনা করেছেন। বার্কলের **'Inquiry'** গ্রন্থ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেণ্টাইনের বাদপ্রতিবাদ এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।[৪৫] সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বিষয়বস্তুর পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করে, তিনি তাকে আগাগোড়া সংশোধন করেছিলেন।

পাঠ্যপুস্তক রচনা করার ব্যাপারে তাঁর যে আগ্রহ অক্লান্ত পরিশ্রম লক্ষ্য করি, তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্য দৃষ্টে এ প্রেরণা তিনি লাভ করেন। বাস্তবিক পক্ষে, তাঁর রচনার সূত্রপাত হয় পাঠ্যপুস্তক লেখার মধ্য দিয়ে। প্রমথনাথ বিশী যে বলেছেন, তাঁর সাহিত্যজীবন সত্যিকার

৪৪। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৯৬

৪৫। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৫৪-৬

ভাবে কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র[৪৬] সে কথা অত্যন্ত খাঁটি। দেশের অন্ধ জনগণকে শিক্ষার আলোকে আনবার মহান প্রয়াস নিয়ে তিনি কর্ম-জীবনে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, পাঠ্যপুস্তক রচনা তারই অঙ্গমাত্র। তাঁর প্রথম রচনা বলে খ্যাত 'বাসুদেবচরিত' অথবা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' তিনি লেখেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষের আদেশে, সে কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে। নীরস হিতোপদেশের কাঠিন্য বিদূরিত হয়ে বেতালের লালিত্য ও সাবলীলতা শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের সহায়তা করেছিলো। এমনি Calcutta School Book Society-র 'বর্ণমালা', ক্ষেত্রমোহন দত্তের 'শিশুসেবধি' ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রচলিত থাকলেও, ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর যে 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশ করেন, সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় তা যুগান্তরের শিক্ষা।[৪৭] এ গ্রন্থ রচনার পেছনে তাঁর যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল তা হচ্ছে গণশিক্ষার প্রসার। 'মুগ্ধবোধ'-এর পরিবর্তে 'উপক্রমণিকা' অথবা 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করার পেছনেও তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো বিদ্যাকে সহজে সাধা-রণের মধ্যে পরিকীর্ণ করে দেওয়া।

বিদ্যাসাগরের চিন্তা কতখানি আধুনিক ছিলো, বিশেষত তাঁর শিক্ষা চিন্তা থেকে সে কথা প্রমাণিত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে 'শিক্ষা' বিষয়ক অত্যাধুনিক য়ুরোপীয় গ্রন্থাদি অনেকগুলো খুঁজে পাওয়া গেছে। সমসাময়িককালে যে সকল য়ুরোপীয় মনীষিগণ 'শিক্ষা' সম্বন্ধে রীতিমতো ভাবতেন তাঁদের সকলের রচনার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন।[৪৮]

দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা সমাজে বড়ো হয়ে এবং প্রাণহীন উপযোগিতাহীন অতীতমুখী শিক্ষা লাভ করে ঈশ্বরচন্দ্র দেশীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয়

৪৬। প্রমথনাথ বিশী, বিদ্যাসাগররচনাসম্ভার, কলিকাতা, ১৩৬৫, পৃ ।।৯

৪৭। বিনয় ঘোষ, 'শিক্ষক বিদ্যাসাগর' পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬২, পৃ ৩৪২

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩৪-৮

সঙ্কীর্ণতা ও শিক্ষা ব্যবস্থার অবাস্তব নিরর্থকতা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন। তদুপরি, যদিও তিনি ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসতে পারেন নি অথবা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন নি, তথাপি নাতিদূরত্ব থেকে সমাজে যে পরিবর্তনের ঝড় উঠেছিলো তার গতি ও প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলো। সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজ একই ভবনে অবস্থিত ছিলো, সুতরাং সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের ছাত্র হলেও, বিদ্যাসাগর ডিরোজিও ও তাঁর বিপ্লবী শিষ্যদের দেখে থাকবেন, তার চেয়েও বড়ো কথা তাঁদের যুক্তিশাণিত বক্তব্য তিনি অবশ্যই শুনে থাকবেন। সে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে তিনি আপনি হয়তো মনের গভীরে অথবা অবচেতনায় ক্ষুব্ধ ছিলেন, ইয়ংবেঙ্গলদের আন্দোলন কিশোর ঈশ্বরচন্দ্র সেই ক্ষোভ ও অসন্তোষকে হয়তো আলোড়িত করে থাকবে। সমকালে না হলেও এ আন্দোলন তাঁকে আর একটু পরিণত বয়সে নিঃসন্দেহে ভাবিত করেছিলো অপর পক্ষে, সমাজের ভেতরে অবস্থান করেই সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতিকে সংশোধনের যে প্রযত্ন ছিলো রামমোহনের, বিদ্যাসাগর যৌবনকালে তা-ও নিশ্চয় বিশেষ কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করেছিলেন। রামমোহনের এই সংস্কারের চেষ্টা ও ইয়ংবেঙ্গলদের ভাঙ্গার আঘাত উভয়ের তুলনামূলক বিচার করে, সম্ভবত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বহু শতাব্দীর বিস্তীর্ণ সময়ের পটভূমিকায় রচিত যে সমাজ, তার জীর্ণতাকে এক চরম আঘাতে আকস্মিক ভাবে ধরাশায়ী করা অসম্ভব, প্রতিক্রিয়া তখন অবশ্যম্ভাবী, অন্যদিকে প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আচারের সংকীর্ণ গণ্ডিকে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একদিন অপসৃত করা অনেক সহজ। রামমোহন সমকালীন সমাজকে সংস্কৃত করার চেষ্টা করেন প্রাচীন ধর্ম ও শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত ও মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করে। এই জন্যে, তিনি সতীদাহ প্রথা তুলে দেওয়া হোক এর প্রস্তাব করেন যে পুস্তিকা লিখেন, তাতে সতীদাহ কতটা শাস্ত্রসম্মত তারই বিচার করেছেন, যেহেতু তিনি জানতেন যদি প্রমাণ করা যায় সতীদাহ শাস্ত্রবিরোধী তাহলে সেটা যত সহজে প্রাচীন

সমাজকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করবে, মানবিকতা অথবা র‍্যাশানালিজ্‌ম ততটা গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে সতীদাহের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখান, তাতে শাস্ত্রের চেয়ে মানবিকতা, যৌক্তিকতা, অথবা সতীদাহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। কেবল সতীদাহ নয়, সমাজের অন্যান্য বহু সংস্কারের বন্ধন থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করার মানসে তিনি অমানুষিক আচারের পরিবর্তে সনাতন ধর্মের মানবতার বাণীকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় প্রচার করে, ধর্ম সম্বন্ধে সকল মিথ্যার অবসান ঘটাতে তিনি উৎসুক হয়েছিলেন।

চরম পন্থা দিয়ে হোক অথবা সংস্কারের বিলম্বিত লয়ে হোক, মিথ্যা আচারসর্বস্ব জীর্ণসমাজের আমূল পরিবর্তন যে আবশ্যক, ডিরোজিয়ান ও রামমোহনীয় শিক্ষিতরা সকলেই তা অনুভব করেছিলেন, উভয় দলের প্রভেদ প্রধানত প্রতিকারের পথ নিয়ে। ঈশ্বরচন্দ্র এঁদের মুক্তবুদ্ধির দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তদুপরি ছাত্রজীবন সমাপণ করে রীতিমতো ইংরেজী শিখে (তাঁর ইংরেজী দেখে মনে হয় ভাষাটি তিনি সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন) তিনি পাশ্চাত্যের মনীষীদের দর্শন অধ্যয়ন করেন। বেন্থামের দ্বারা প্রভাবিত রামমোহন যদি 'সাড়ে তিন কোটি' দেবদেবীর বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারেন, পরবর্তী প্রজন্মের সদস্য এবং নিঃসন্দেহে মহত্তর প্রতিভার অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র কেন বেকন, হিউম, বেন্থাম ও মিলের রচনা পাঠে নিরীশ্বর হতে পারবেন না, বিশেষত অর্থকৃচ্ছ্রতার মুখে ধর্মের অর্থ-হীনতা ও ভণ্ডামী আত্যন্তিকভাবে যিনি আবাল্য অনুভব করেছেন।

ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস যতই প্রবল হোক না কেন, সংস্কার বিষয়ে তিনি মূলত রামমোহনের পথ বেছে নিয়েছিলেন, অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি রাম মোহনের চেয়ে অধিকতর সংসাহস, একাগ্রতা, অবিচলতা ও প্রত্যক্ষতা

দেখিয়েছেন। বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করলেন বই লিখে কিন্তু ইংরেজ সরকারকে প্রভাবিত করে আইন পাশ করান যুক্তি দেখিয়ে। তারপর তিনি এখানেই থেমে যাননি, আর্থিক সাহায্য ও লোকবল দিয়ে তিনি বাস্তবে বিধবাবিবাহ দিলেন, এমন কি তাঁর পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন এক বিধবা বালিকার। বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত, মানবিক বিবেচনাই তার যৌক্তিকতা প্রমাণে যথেষ্ট, তার জন্যে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রের দ্বারে ধর্ণা দেওয়া প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সংস্কারের মোহাচ্ছন্ন জনমনকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই তিনি বিচলিত করতে চেয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বৈধব্যের সাথে সমানুপাতিক, এই জন্যে তার উচ্ছেদে অতঃপর বিদ্যাসাগর তৎপর হন। প্রসঙ্গত, বিষয়টি স্ফটিকস্বচ্ছ করা আবশ্যক যে, কর্মপদ্ধতির আপাতসাদৃশ্য থাকলেও, বিদ্যাসাগর রামমোহনের মতো সংস্কারবাদী ছিলেন না, তাঁর চিন্তা ও কর্ম ছিলো রীতিমতো বৈপ্লবিক। তবে সমাজকে ভাঙ্গার আঘাত তিনি দেননি, কেননা তিনি জানতেন সে চেষ্টা কালোপযোগী অথবা বাস্তব হবে না। অকাল ও অবাস্তব প্রয়াস ইয়ংবেঙ্গলদের ব্যর্থতা অনিবার্য করে তুলে ছিলো, আপনি তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই, বিদ্যাসাগর সংস্কারের ধীরপন্থার দ্বারা তাঁর বৈপ্লবিক ধ্যানধারণাকে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। বিধবা বিবাহের প্রবর্তন এবং বাল্য ও বহু বিবাহের নিবর্তনের চেয়েও ঈশ্বরচন্দ্রের গণসচেতন মনের বড়ো পরিচয় বিধৃত তাঁর শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায়। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, ধর্মের পসরা ফেরি করে দিনযাপনের কাল শেষ হয়ে এসেছে, মানুষকে অধিকতর শোচনীয়তা থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ শিক্ষার বিকিরণ। অধ্যক্ষ হয়ে এই কারণে, প্রথমেই তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্যে, এ যাবৎ রুদ্ধ, সংস্কৃত কলেজের দ্বার খুলেছেন। এবং নবীকরণের মাধ্যমে অতীতমুখী শিক্ষাকে আধুনিক যুগোপযোগী করার প্রয়াস পান। কিন্তু কলকাতার মুষ্টিমেয় ধনিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু সংখ্যক ছাত্রদের ভেতর

শিক্ষাকে সীমিত করে রাখলে, অসাড় জনচিত্তকে জাগানো সম্ভব হবে না, এ তিনি ভালো করেই জানতেন। তাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে পরের বছর মে মাসের ভেতর হুগলি, বর্ধমান মেদিনীপুর ও নদিয়ায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্ত বিদ্যালয়ে ১৩০০ ছাত্রী ভর্তি হয়। এ ছাড়া ১৮৫৫ এর আগষ্ট থেকে শুরু করে ছ'মাসের ভেতর বিভিন্ন জেলায় তিনি ২০টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলকাতার মেট্রোপোলিটান কলেজে তৎকালে সবচেয়ে কম ব্যয়ে দরিদ্র ছাত্ররা পড়াশোনা করতে পারতো।[৪৯]

শিক্ষাকে সার্বজনিক করার চেষ্টা কেবল বিদ্যালয় স্থাপন প্রয়াসের মধ্যে সীমিত ছিলো না, বরং বিজ্ঞানসম্মত টেক্স্টবুক রচনা করে সহজে এবং অল্প সময়ে শিক্ষাসম্প্রসারণ তাঁর অন্যতম প্রচেষ্টা ছিলো, আগেই তা বলা হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে পাঠ্য-পুস্তক রচনার প্রশংসা করা সম্ভব হয়নি, কেননা এর পেছনে বিদ্যাসাগরের আসল যে উদ্দেশ্য ছিলো, তা-ই তাঁর কাছে ধরা পড়েনি। সহজে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, ছাত্ররা যাতে সংস্কারমুক্ত একটি বাস্তব মানসের অধিকারী হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের লক্ষ্য সেদিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিলো। তাই দেখতে পাই, 'ঈশ্বরের কথা তিনি প্রথমে আদৌ বলেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন এ গ্রন্থ মার্জিত করেন, তখনও ঈশ্বর এলেন বস্তুর পরে।'[৫০] বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে টেক্স্টবুকের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা উপলব্ধি করেন বলেই, বিদ্যারসাগর হলেও তিনি নিম্নশ্রেণীর জন্যে বই লিখতেন। অনুমান যদি অমার্জনীয় অপরাধ না হয়, তা হলে বলা চলে,

৪৯। **Binoy Ghose, 'Iswar Chandra *V*idyasagar', 'Studies in the Bengal Renaissance', ed. Atul C. Gupta, P.** 53

৫০ বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৭

বিদ্যাসাগর যদি শতবর্ষ পরে আজকের দিনে লিখতেন, তা হলে শিক্ষাকে আজো সমাজের উপরতলায় গণ্ডিবদ্ধ দেখে নিশ্চয়ই বই লিখতেন বয়স্কদের শিক্ষার উপযোগী করে। সে গ্রন্থ অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক হতো, আর তাতে মানুষের ইতিহাস যে প্রকৃতপক্ষে শোষণের ইতিহাস তা-ই হয়তো যুক্তাক্ষর বর্জিত একান্ত সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা থাকতো। আর এযুগে জন্মালে তিনি শিক্ষকতা না করে, বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা হতেন সম্ভবত।

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের মধ্যে একটি আপাত অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ভাষা প্রাচীনপন্থী বলে ভ্রম হতে পারে। সত্যিকার বিচারে বোধ হয় এ পর্যবেক্ষণ টেকে না। কেননা, তাঁর বিষয়বস্তু প্রাচীন হলেও, দেখা যাবে, যে রস তাতে পরিবেশিত তার মধ্যে ধর্ম ও সংস্কারের কোনো ভেজাল নেই। বরঞ্চ, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও মানবতাবোধ তার কেন্দ্রীয় ভাববস্তু ; একান্তভাবে সাহিত্যরুচি গঠনের নিমিত্ত তিনি প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে তাঁর অনুবাদ ও বহু জীবনী রচনার কারণও একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাজাত। আর বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্পর্কে বক্তব্য পূর্বেকার ভাষার তুলনায় তাঁর ভাষা অনেকটা গণমুখী। প্রসঙ্গত সুপ্রচলিত সেই জনপ্রিয় গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি পণ্ডিতসভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, লিখিত হলে তার ভাষাদৃষ্টে অধিকাংশ পণ্ডিতের মন্তব্য : 'অ্যাঁ, এ কী হয়েছে ? এ যে বিদ্যাসাগরের ভাষার মতো—সবই বোঝা যায়!' বস্তুত, বিদ্যাসাগর সর্ব প্রথম বাংলা গদ্যের একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দান করেন। 'বিদ্যাসাগরের অসামান্য কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়াম পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা[৫১] এবং সমসাময়িক সংবাদ-

৫১ পণ্ডিতি, বিশেষত সংস্কৃত আলংকারিক গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরীর অনুবাদ (১৮৫৪)॥

পত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযোগ্য গ্রহণবর্জন করিয়া সাহিত্যযোগ্য লালিত্যময় সুডোল গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠা করিলেন যাহা সাহিত্যের ও সংসারের প্রায় সব রকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ।"[৫২] তদুপরি বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে বিশেষ করে পৌরুষ রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর রচনাশৈলি বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সকল বিষয় প্রকাশের সুপ্ত ক্ষমতা ধারণ করতো। ম্রিয়মাণ জাতির অসাড় চিত্তকে জাগ্রত করার নিমিত্ত, জ্ঞানের বাহন বলে গণ্য হতে পারে, এরূপ একটি গদ্যরীতির আবশ্যকতাই আত্যন্তিক। জনগণের সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদ্যাসাগর তাঁর গদ্যকে প্রস্তুত করেছিলেন। বুদ্ধি ও কৌতুকদীপ্ত তাঁর রচনাভঙ্গিতে তৎসম শব্দের কিঞ্চিত বাহুল্য অবশ্য স্বীকার্য। তাছাড়া 'বেতালে' অথবা 'সীতার বনবাসে' তিনি অবরুদ্ধ থাকেন নি, বরং নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্ণপরিচয়ে অথবা আত্মজীবনীতে কিংবা প্রভাবতী সম্ভাষণে, অতি অল্প হইল আবার অতি অল্প হইল বা ব্রজবিলাসে তাঁর ভাষা নিয়ত প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে।

"উপযুক্ত ভাইপো, খুড়র সঙ্গে, বিচার করিতে পিছপাও হইবেন, যদি কেহ ভুলভ্রান্তিতেও, সেরূপ ভাবেন, তিনি যত বড় ধনী, যত বড় মানী, যত বড় বিদ্যান, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় হাকিম, যত বড় আমলা, যত বড় তেঁদড়া, যত বড় বেদড়া হউন না কেন, তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মতো, টুকটুকে হউক, আর রাম ছাগলের মতো চাপ দাড়িতে সুসজ্জিত ও সুশোভিত হউক, ঠাস ঠাস করিয়া, দশ বার জোড়া চড় মারিয়া সেই বে-আদবকে, চিরকালের জন্য, দুরস্ত করিয়া দিব। ইহার জন্য যদি শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবীর সূক্ষ্ম বিচারে ও অকাট্য ফয়তা অনুসারে, ক্রমান্বয়ে ছয় মাস, ফাঁসি যাইতে হয়, তাহাও মঞ্জুর। আমি যে কেবল মুখে আস্ফালন করিতেছি, কেহ যেন তাহা না ভাবেন। ইতিপূর্বে শ্রীমান তর্কবাচস্পতি খুড়র সঙ্গে কেমন হুড়হুড়ি

৫২ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬২, পৃ ১০

করেছি, তাহা কি আপনারা জানেন না, না কখনও শুনেন নাই। এ যাত্রায় খুড়র কাছে দুই চারিটি প্রশ্ন করিব। ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলে, রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইব। যদি উপেক্ষা করিয়া, অথবা ভয় পাইয়া, অথবা কোন নিগূঢ় কারণের বশবর্তী হইয়া, খুড় মহাশয় উত্তর দানে বিমুখ হন, দুত্ত দুত্ত বলিয়া, হাত তালি দিয়া ইয়ারবর্গ লইয়া, কিয়ৎক্ষণ আনন্দে নৃত্য করিব, পরে রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মড়মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"[৫৩]

এ ভাষা আজকের বিচারেও সংস্কৃতানুসারী বলে গণ্য হবে না। কিন্তু প্যারীচাঁদের ভাষা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলে, তাঁকে মোটামুটি বিদ্যাসাগরের বিপরীত বলে মনে হবে। সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতানুগ ভাষার অনুশীলনে লিপ্ত, তখন অন্ততঃ আলালের ঘরের দুলাল ও মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায় এই দুটি গ্রন্থে আমরা প্যারীচাঁদকে অপূর্ব কথ্যভায়ার শিল্পী বলে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর অপর কীর্তি, সমকালীন সমাজ জীবনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টা। কিন্তু উভয় ব্যাপারেই প্যারীচাঁদ, আমাদের মতে, তাঁর দাবির অধিক প্রশংসা পেয়েছেন। সত্য বটে, সাময়িকতা তাঁর রচনায় যত সাবলীল ও বলিষ্ঠতার সাথে চিত্রিত, সমসাময়িক অন্য কোনো লেখকে তেমন নয়, অথবা তাঁর ভাষা স্থানে স্থানে যত বেগবান ও ইডিওমেটিক, অন্যান্যের রচনা তুলনামূলক বিচারে অনেক পিছিয়ে পড়বে, তথাপি কথ্য ভাষার ব্যবহার অথবা তৎকালীন জীবনচিত্রণ বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের পূর্বেও দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন[৫৪] এ উভয় কৃতিত্বের আংশিক দাবিদার। তা ছাড়া কথ্য বাংলার ব্যবহার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ থেকেই প্রচলিত, কট্টর পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়েও

৫৩ ব্রজবিলাস, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ ৪১২—৩

৫৪ রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮২২—৮৬

তার নিদর্শন অনুপস্থিত নয়। তা ছাড়া আর একটি কথাও স্মর্তব্য 'আলালে' অথবা 'মদ খাওয়া বড় দায়ে' হাস্যকর রকমের গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী সাধুগদ্যের নমুনা এমন কি সংলাপে অপ্রত্যক্ষ নয়।

"এক স্ত্রী সত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ। যে ব্যক্তি আপন ধর্ম বজায় রাখিতে চাহে সে এ কর্ম কখনই করিতে পারে না। যদ্যপি ইহার উল্টো কোন শাস্ত্র থাকে সে শাস্ত্রমতে চলা কখনই উচিত নহে। সে শাস্ত্র যে যথার্থ শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যদ্যপি এমন শাস্ত্রমতে চলা যায় তবে বিবাহের বন্ধন অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মন পুরুষের প্রতি তাদৃশ থাকে না ও পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতিও চলবিচল হয়। এরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুধারা মতে চলিতে পারে না, এ জন্যে শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য।" ৫৫

—বিদ্যাসাগরের নয়, বর্তমান ভাষা আলালের অন্যতম চরিত্র বেণীবাবুর। সাধুভাষা ব্যবহারে প্যারীচাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি মাত্র পার্থক্য আছে। বিদ্যাসাগরের ভাষাটি অত্যন্ত ভারসাম্যবিশিষ্ট, ঋজু, প্রাঞ্জল ও সাবলীল, প্যারীচাঁদের ভাষা প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত, গতিহীন, শব্দব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে মিষ্টত্ববর্জিত।

প্যারীচাঁদ যত পরিণত হয়েছেন, তাঁর ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য ও আড়ষ্টতা ততোই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাঁর সাধুচালের বীজ প্রথম গ্রন্থেই উপ্ত ছিলো। অপরপক্ষে, বিদ্যাসাগর পরিণতির সাথে সাথে ভাষাকে ক্রমশ সহজ হতে সহজতর করেছেন, এমন কি, প্রতি সংস্করণে প্রথম দিকের গ্রন্থগুলির ভাষাও মার্জিত ও সরল করেছেন।

বিষয়বস্তু নির্বাচন সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। প্রথম দিকে প্যারীচাঁদে সাময়িকতা যদিও বেশ প্রবল ছিলো, কিন্তু শীঘ্র তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য হলো প্রাচীনতা—চিন্তার ক্ষেত্রে, দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, বক্তব্যের ক্ষেত্রে।

৫৫ প্যারীচাঁদ রচনাবলী, পৃ ১৩০—১

তাঁর প্রকৃতি তখন অগ্রগতির পরিপন্থী। উল্টো দিকে, বিদ্যাসাগর ছিলেন চলতি হাওয়ার পন্থী।

"যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে, বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কাল গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। যারা অতীতের জড় বাধা লংঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন।" [৫৬]

সে কারণে, প্রতিনিয়ত তিনি যুগের সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁর রচনাবলীর বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকেও এ কথা প্রতীয়মান হয়। ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন, দূর ভবিষ্যৎকেও তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন, এই জন্যেই ভাষা ও বিষয়বস্তুর ব্যাপারে তাঁর সংস্কারমুক্ত প্রাগ্রসরতা অনায়াসে লক্ষ্যগোচর হয়।

উপসংহারে বলা যায়, তাঁদের পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষার পদ্ধতি ও বিষয়, জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিকোণ, চারিদিকের মানুষের প্রতি তাঁদের ঔদাসীন্য অথবা সহমর্মিতা, বহমান কালের প্রতি তাঁদের সচেতনতা, রচিত সাহিত্যের বক্তব্য ও ভাষা—সবকিছুতেই প্যারীচাঁদ আশ্চর্যজনকভাবে বিদ্যাসাগরের বিপ্রতীপ। মুক্ত আকাশের উজ্জ্বল আলোকের আহ্বান শুনেও একজন পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলেন, গাঢ় অন্ধকারে দৃঢ় মূল হয়েও মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে উৎক্রমণের ইতিহাস অন্য জনের।

---

৫৬ রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯, পৃ ৭৫৯—৬০